সর্বাত্মক বিপ্লব বা সম্পূর্ণ ক্রান্তি (Total Revolution)

জয়প্রকাশ নারায়ণের বহুমুখী চিন্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সর্বাত্মক বিপ্লব বা সম্পূর্ণ ক্রান্তি বা Total Revolution. দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল ভারতের রাজনীতির অলিতে গলিতে তিনি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেছিলেন এবং ভারতীয় জনগণের সকল স্তর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল নিখুঁত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ও শোষিত নিপীড়িত জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু। রাজনীতিক জীবনের প্রত্যূষে মার্কসবাদ লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জীবনের শেষ বেলায় এসে জয়প্রকাশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একটি সর্বাত্মক বিপ্লবই ভারতের সার্বিক বিকাশ সাধনে সক্ষম এবং তাই তিনি এর ডাক দিয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালের ৫ই মে পাটনার গান্ধী ময়দানে জয়প্রকাশ (অতঃপর জে.পি.) এক বিশাল জনসমাবেশে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ক্রান্তির আহ্বান জানান। সারা ভারতের রাজনীতিক অবস্থা তখন টালমাটাল। দুর্নীতি ও জনবিরোধী কাজকর্মে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি লিপ্ত। রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতি নির্বাসিত। দলত্যাগের হিড়িক ও নতুন দলে যোগদান বা দলগঠন ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। এই অবস্থার ও অসহনীয় পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য জে.পি. সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এক সম্পূর্ণ ক্রান্তি এসে সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন না আনলে মুক্তি সম্ভব নয়।

১৯৭৪ সালে বিপ্লবের ডাক দিলেও জে.পি. একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন যখন ১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুর অবস্থা ঘোষণা করে জে.পি. সহ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারে থাকাকালীন জে.পি. তাঁর রোজনামচা বা ডায়েরী লিখতেন এবং তার মধ্যেই সর্বাত্মক বিপ্লব ধারণাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন।

জয়প্রকাশ যখন সম্পূর্ণ বিপ্লবের কথা বলেছিলেন তাঁর মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে বিপ্লব একদিনে শেষ হবে না – এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া অর্থাৎ একে চালিয়ে যেতে হবে। কারণ সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন কখনও একটিমাত্র বিপ্লবের ফলে আসবে না – একাধিক বিপ্লবের প্রয়োজন।

দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে হঠাৎ করে আসা বিপ্লব রাজনীতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করলেও মানুষের মন ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই সঙ্গে মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় না যার ফলে রাজনীতিক বিপ্লবের সুফলগুলি সাময়িক আকার ধারণ করে অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়। খণ্ডিত লক্ষ্যার্জনকে জে.পি. আসল বিপ্লব বলতে চাননি।

সম্পূর্ণ ক্রান্তি হল প্রবল স্রোত তুল্য যার টানে যা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত সব ভেসে যাবে। প্রবল স্রোতের মুখে কিছু বাধা টিকতে পারবে না। তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবকে রবীন্দ্রনাথের কালবৈশাখীর সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধুলো, খড়কুটো, শুকনো পাতা ও আবর্জনা উড়ে যায়। কবিগুরু কাব্যিক ভাষায় একথাগুলো বললেও বিপুল পরাক্রমশালী কালবৈশাখী আসলে তাই করে। জে.পি'র সর্বাত্মক বিপ্লবের লক্ষ্যও তাই। সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রভাবে এসে নাগরিকের হৃদয়, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির পরিবর্তন হলে সমস্ত অন্যায়, অবিচার প্রভৃতিকে অপসারিত করবে।

ব্যক্তির মননকে যাবতীয় নিষিদ্ধ প্রবৃত্তি ও বিবেচনা থেকে মুক্ত করা এর লক্ষ্য। মানসিক প্রক্রিয়া এমনভাবে সুবিন্যস্ত হবে যে ব্যক্তি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেগুলির অপসারণে উদ্যোগ নেবে। বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। সর্বাত্মক বিপ্লবের এটি একটি লক্ষণীয় দিক। বস্তুগত ও মনোগত দিকের মধ্যে জয়প্রকাশ কোন পার্থক্য টানেন নি। বরং একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। মনে রাখতে হবে উভয় প্রকার পরিবর্তন এলে তা হবে আমূল বা সর্বাত্মক।

নিষিদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি জয়প্রকার সবিস্তারে বলেননি। তবে তাঁর মনে কী ছিল তা আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তাঁর সমকালীন ভারতের রাজনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ও জনগণের নৈতিক ও মূল্যবোধের অধোগামিতা তাঁর মনকে রীতিমত পীড়িত করত। অর্থ ও ক্ষমতার লোভে দলত্যাগ, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎকোচ গ্রহণ, রাজনীতিকদের মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা ইত্যাদি। আমরা মনে করি যে জয়প্রকাশ নিষিদ্ধ প্রবৃত্তি বলতে এগুলির উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। সমাজ জীবনের সর্বস্তরে এই প্রবণতা ভারতের অগ্রগতির পথে হিমালয়তুল্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জে.পি. লক্ষ্য করেছিলেন যে জড়তা, অনীহা ও অসচেতনতা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। যাবতীয় ক্লীবতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুনাগরিক করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের উদ্দেশ্য। ক্লীবতা ও জড়তাই ব্যক্তিকে জড় বস্তুর স্তরে নামিয়ে দেয়। ছোটখাট আন্দোলন বা খণ্ডিত বিপ্লবের সাহায্যে ব্যক্তিকে অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে আনা যাবে না বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ ক্লান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল ওঠো, জাগো। স্বামী বিবেকানন্দও সেডাক দিয়েছিলেন।

সর্বাত্মক বিপ্লবের মোটামুটি দুটি পর্যায় – বস্তুগত ও মনোগত। কিন্তু কোনটা আগে ও কোনটা পরে তা নিয়ে, আমাদের মনে হয়, জে.পি.'র কোনো মাথাব্যথা চিল না। তবে তিনি মনে করতেন

যে বস্তুগত পরিবর্তনের সাথে সাথে মনোগত পরিবর্তনকে আনতে হবে অথবা আসা উচিত। কারণ বিপ্লব রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এনেছিল মনের পরিবর্তন না এলে সেগুলি তলিয়ে যাবে। উভয় প্রকার বিপ্লবের একসঙ্গে আসা একান্ত প্রয়োজন।

জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লবকে আমরা স্থায়ী বিপ্লব বলতে পারি। কারণ যে পর্যন্ত জনগণের মনের ও দৃষ্টিভঙ্গির জগতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিপ্লব তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণলক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারবে না।

জে.পি.'র সর্বাত্মক বিপ্লবের তাৎপর্যও অন্যত্র নিহিত। বিশ্বের অন্যত্র যে সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেই সমস্ত বিপ্লবের সঙ্গে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও রক্তপাত জড়িত ছিল। কিন্তু তিনি যে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তা ছিল অহিংস বিপ্লব। সমাজের সকল স্তরের মানুষ অহিংস উপায়ে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে সমাজের আমূল পুনর্গঠন সম্ভব করে তুলবে যা শেষ পর্যন্ত একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করবে।

অহিংস উপায়ে বিপ্লব করার দিকে তিনি ঝোঁক দিয়েছিলেন প্রধানত দুটি কারণে। এক, জয়প্রকাশ গান্ধীবাদে বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিলেন যদিও রাজনীতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে তিনি গান্ধীর পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। যেহেতু গান্ধী ছিলেন অহিংস নীতির একনিষ্ঠ পূজারী তাই জয়প্রকাশ অহিংস নীতি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারেননি। দুই, বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত হিংসাত্মক বিপ্লব সাধিত হয়েছে সেগুলিতে আখেরে লাভ কিছুই হয়নি। পক্ষান্তরে জীবন ও সম্পত্তি হানি হয়েছে বিপুল পরিমাণে এবং সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। মানবতাবাদের অকৃত্রিম পূজারী জে.পি. জীবনহানিকে খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি বলে অহিংস উপায়ে বিপ্লব করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। হিংসা কখনও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে না বলে তাঁর প্রত্যয় জন্মেছিল।

সর্বাত্মক বিপ্লব বলতে জয়প্রকাশ কী কী বলতে চেয়েছিলেন তা তিনি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি লিখেছেন – "I have been saying that total revolution is a combination of seven revolutions – social, economic, political, cultural, ideological or intellectual, educational and spiritual. This number may be increased or decreased. For instance the cultural revolution may include educational or ideological revolutions." জয়প্রকাশ তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্যে সাতটি বিপ্লবের কথা বলেছেন। তবে সংখ্যা বাড়তে বা কমতে পারে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে মতাদর্শগত বিপ্লবকে ধরা যেতে পারে। আবার বৌদ্ধিক বা ইনটেলেকচুয়াল বিপ্লব বিপ্লব বলতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত ও দার্শনিক বিপ্লব বোঝায়। যাই হোক, তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম হল একটি মাত্র বিপ্লব কখনও সর্বাত্মক বিপ্লব করতে পারে না।

জে.পি. আর্থনীতিক জগতে বিপ্লবকে সর্বাত্মক বিপ্লবের শীর্ষে স্থাপন করে গেছেন। আর্থনীতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে হলে দ্রুত আর্থনীতিক বিকাশের বিশেষ প্রয়োজন। এর জন্য তিনি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছেন। (ক) আর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিদ্যমান তার অবসান ঘটানো, (খ) পূর্ণ নিয়োগ বা ফুল এমপ্লয়মেন্ট সুনিশ্চিত করা, (গ) প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরি নির্ধারণ ও জিনিসপত্রের মূল্যমানের উর্ধ্বগতি রোধ করা। (ঘ) শিল্পে স্বায়ত্ত শাসনের প্রবর্তন করা। (ঙ) সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করা। এখানে তিনি পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। (চ) কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা। (ছ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের উন্নতির প্রতি যথাযথ নজর দেওয়া। এর জন্য গ্রামীণ শিল্পায়নের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ গ্রাম-ভিত্তিক শিল্প বিকাশপ্রাপ্ত হলে গ্রামের বেকার সমস্যা দূর হবে এবং স্থানীয়ভাবে যে সমস্ত সম্পদ পাওয়া যায় সেগুলির সদ্ব্যবহার করা যাবে। (জ) গ্রামগুলিকে শহরের শোষণ থেকে মুক্ত না করলে চলবে না। জয়প্রকাশ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির কৃষিক্ষেত্রে সামূহিকীকরণের বিরোধিতা করেছেন। জমির মালিকানা গ্রামগুলির হাতে তুলে দেওয়া জরুরি। (ঝ) ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন গ্রামীণ ও কুটির শিল্প করবে। (ঞ) ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সর্বাত্মক বিপ্লব কৃষির উন্নতির প্রতি নজর দেবে। (ট) পুঁজি প্রস্তুতের নিমিত্ত সঞ্চয় গড়ে তোলাও বিপ্লবের কাজ। কারণ পর্যাপ্ত পুঁজি ব্যতিরেকে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। (ঠ) বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে সামাজিক মালিকানা বা সোসাল ওনারশিপ নীতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। (ড) পুঁজিবাদী শিল্প ব্যবস্থার চেয়ে পাবলিক কর্পোরেশন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ বিপ্লবোত্তর সমাজ নেবে। কারণ এই ধরনের শিল্প সংস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণ সহজেই সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবে যে আর্থনীতিক কর্মসূচীর সুপারিশ করেছিলেন তা রীতিমত ব্যাপক। আর্থ-ব্যবস্থার কোন দিক তাঁর সুপারিশ থেকে দাবি পড়েনি। আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই পরিকল্পনার মধ্যে পাশ্চাত্যের সমাজবাদী ধ্যান ধারণার যেমন বিশেষ প্রাধান্য আছে ঠিক তেমনি ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক পরিস্থিতিরও প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতির সুষম বিকাশের জন্য কৃষি ও শিল্প উভয়ের যুগপৎ বিকাশ যে প্রয়োজন জে. পি. তা ভালভাবে উপলব্ধি

করেছিলেন। আবার ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষির উপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ যে প্রয়োজন তাও তিনি জানতেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে জে.পি. তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের আর্থনীতিক কর্মসূচীর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মিলন ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

সর্বাত্মক বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সামাজিক বিপ্লব বা সোসাল রিভল্যুশন। (১) শতাব্দী কাল ধরে চলে আসা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারগুলি ভারতীয় সমাজে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে এবং এগুলি যে কেবল প্রগতি-বিরোধী তা নয়, ব্যক্তি মর্যাদার পরিপন্থী। এরা দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বচ্ছ করে তুলেছে। তাই জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবে এগুলির খোল-নলচে-সহ অপসারণ করতে চেয়েছিলেন। (২) জাতপাতের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার জন্য জয়প্রকাশ বিভিন্ন ধর্ম্মীয় গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের কথা বলেছেন। (৩) জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কোনরকম সিদ্ধান্ত নেবে না। (৪) জাতিগত প্রথা মানতে অস্বীকৃতি জানালে কাউকে অপরাধী বলে ঘোষণা করা অথবা বিদ্রূপ বর্ষণ করা যাবে না। (৫) জাত-পাতের বন্ধন যত তাড়াতাড়ি শিথিল করে তোলা যায় তার জন্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে। (৬) সারা ভারতে একটি মাত্র জাতি আছে এবং তা হল মানব জাতি। এই বোধ জাগিয়ে তোলা বিপ্লবের কাজ।

রাজনীতিক ও প্রশাসনিক বিপ্লব সম্পর্কে জয়প্রকাশ বলেছেন যে (১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই-এর কাজ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি বা সংস্থা করবে না, করবে স্থানীয় গণকমিটি। (২) নির্বাচন ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তিনি লিস্ট ব্যবস্থা (list system) এবং মেজরিটি ব্যবস্থা (majority system) প্রবর্তনের কথা বলেছেন। (৩) দলত্যাগ ভারতের রাজনীতিকে ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত করেছে। সুতরাং দলত্যাগ রোধ বা বন্ধ করতে হলে সর্বাত্মক আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকবে। (৪) জনপ্রতিনিধিরা দু'বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। (৫) সংসদ, বিধানসভা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে যাঁরা কাজ করবেন বিশেষ করে উচ্চ পদাধিকারিগণ নির্দিষ্ট সময়ান্তর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাখিল করতে হবে। (৬) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে সরকার জনমত যাচাই করে নেবে। সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত যথেষ্ট নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কেবল সংখ্যাতত্ত্বের ধোঁকাবাজি। জনমতের স্থান এখানে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। সমস্যার সমাধানও সুদূর পরাহত। (৭) প্রশাসনিক ও রাজনীতিক বিপ্লবের এক জায়গায় জে.পি. একটি অত্যন্ত "বিপজ্জনক" কথা বলেছিলেন। সরকারের যে সমস্ত নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বেআইনি ও নির্দোষ

জনগণকে হত্যা করার জন্য জারি করা হয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সেই নির্দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করবে। তাঁর এই নির্দেশ বা আহ্বান তদানীন্তন প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে তিনি সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন।

সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য জয়প্রকাশ সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জনগণের শিক্ষাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন না হলে কেবল রাজনীতিক পরিবর্তন দেশের সার্বিক বিকাশ সাধন করতে পারে না। প্রিজন ডায়েরীর এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন – In our heritage there are somethings that are noble and valuable ... But we have also inherited a great deal of superstition and wrong values and unjust social relations. অন্যায় ও অযৌক্তিক সামাজিক সংস্কার ও বিধিনিষেধগুলি এবং বাধ্যবাধকতা সমূহের বিনাশ সাধন করতে না পারলে সমাজের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যাবে না। ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারগুলি সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। এগুলির অপসারণের জন্য বিপ্লব প্রয়োজন।

(১) প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। আর্থনীতিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনা জুড়ে দেওয়া প্রয়োজন। (২) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। দেশে প্রতিভা ও যোগ্য ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু সর্বস্তরে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতি প্রাধান্য বিস্তার করায় যোগ্যতা ও দক্ষতা অবহেলিত। ফলে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন ব্যাহত। (৩) শাশ্বত মূল্যবোধগুলির চর্চা বাড়াতে হবে। (৪) পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা প্রয়োজন। (৫) সহনশীলতা ও সহযোগিতা নাগরিকগণ যাতে অনুশীলন করে সে ব্যবস্থা সরকার করবে। (৬) নৈতিক আদর্শসমূহ ব্যাপক হারে প্রচারের ব্যবস্থা সমাজের কর্তৃপক্ষ করবে। (৭) অভিন্ন কল্যাণের প্রতি নাগরিগণের যাতে আনুগত্য বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রায়োগিক দিকের প্রতিও জয়প্রকাশের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বিপ্লবের জন্য তিনি কখনও হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনের কথা বলেননি। সম্মতকরণ, অসহযোগিতা, আইন অমান্য প্রভৃতিকে তিনি উৎকৃষ্ট পথ বলে গণ্য করতেন। বলা বাহুল্য এগুলি গান্ধী প্রদর্শিত পথ ঃ জে.পি. যখন সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দেন তখন তিনি পুরাদস্তুর গান্ধীবাদী ছিলেন। খুব জোর হরতাল বা ধর্মঘটের ডাক বিপ্লবীর দিতে পারে। বিপ্লবের নেতৃত্বের জন্য জে.পি. যুব সম্প্রদায় ও ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মনে এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে ছাত্ররা সঙ্কীর্ণতা,

স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির ঊর্দ্ধে। একমাত্র তারাই সৎ পথে থেকে বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারবে। বিপ্লবের পথে সব চেয়ে বড় বাধা আমলাতন্ত্র। তার মোকাবিলা প্রয়োজন।

কেন সর্বাত্মক বিপ্লব ?

প্রশ্ন হতে পারে কেন জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন ? কেন তিনি একে একটি স্লোগানে পরিণত করেছিলেন ? আমরা জানি আজ পর্যন্ত বিশ্বে অনেকগুলি বিপ্লব হয়ে গেছে এবং এদের মধ্যে প্রধান তিনটি – ফরাসী বিপ্লব, চীনের বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব। সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দেওয়ার আগে তিনি এই বিপ্লবগুলির কাজ ও সাফল্য অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে অনুধাবন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এরা সমাজের আমূল অর্থাৎ সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়নি। বিপ্লবে সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক ব্যক্তির অংশগ্রহণ থাকলেও বিপ্লবোত্তর পর্বে সমস্ত ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হয়েছে যার ফলে অধিকাংশ মানুষ সমাজের কার্যকরী ও অনুধাবনযোগ্য মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই প্রবণতা বিপ্লবকে মূল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছে।

নয়ের দশকের গোড়ায় অধুনালুপ্ত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যখন ভেঙে গেল তখন অনেকেই বলতে লাগলেন যে লেনিন ও তাঁর অনুগামীরা ১৯১৭ সালে যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিপ্লব করেছিলেন তা ফলপ্রসূ হয়নি বলে এই বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেবল জনসাধারণ যে ক্ষমতা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তা নয়, সোভিয়েত সমাজে একশ্রেণীর মহাপরাক্রমশালী আমলা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। চীনে কৃষকদের দ্বারা প্রধানত বিপ্লব সংঘটিত হলেও শেষ পর্যন্ত কৃষকরা ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। কোন কোন সমালোচক বলে থাকেন যে কার্যত ফরাসী বিপ্লব জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রদানে সক্ষম হয়নি। ইতিহাস থেকে জয়প্রকাশ এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে বিশ্বের বিপ্লবগুলিকে তিনি দিশারী রূপে ব্যবহার না করে ভারতীয় পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের বিপ্লব আনার স্লোগান তুলেছিলেন।

জয়প্রকাশ বলেছেন যে, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অতীতে যে বিপ্লব হয়েছিল সেগুলিকে প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ বা সর্বাত্মক বা সম্পূর্ণ বিপ্লব বা ক্রান্তি বলা চলে না। এগুলিকে অর্ধ-বিপ্লব বলাই উচিত। এই সমস্ত বিপ্লবের সঙ্গে কেবল যে হিংসা জড়িত ছিল তা নয়, এরা পুরনো আমলের ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লব সেখানে

সামন্ততন্ত্র ও রুশ বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে সক্ষম হলেও সামাজিক, আর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। সেই কারণে এদের সম্পূর্ণ বিপ্লব বলা চলে না, অর্ধ-বিপ্লব মাত্র ।(a violent revolution by its very logic turns out every time to be half a revolution) জয়প্রকাশ বলেছেন বিপ্লব কেবল রাজনীতিক বিপ্লব নয়, সামাজিক ও আর্থনীতিকও বটে এবং একে তা হতে হলে সামাজিক বিপ্লব আনা একান্ত দরকার এবং যখন তা আসবে তখন সেটি হবে সর্বাত্মক বিপ্লব। একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করা হবে প্রকৃত বিপ্লবের প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু নতুন সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করতে হলে বিপ্লবের কতকগুলি উচ্চাদর্শ থাকবে যেগুলি হবে সমাজ, অর্থনীতি ও আধ্যাত্ম সংক্রান্ত এবং এগুলি সম্পর্কে জনগণ অবহিত হবে ও বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শ ও নৈতিক লক্ষ্যাজর্নে যে বিপ্লব সমর্থ একমাত্র তাকে সর্বাত্মক বিপ্লব বলা যাবে। জয়প্রকাশ বলেছন যে হিংসাত্মক উপায়ে বা শ্রেণী সংগ্রামের সাহায্যে যে বিপ্লব বাস্তবায়িত করা হয়, শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে – উপরিউক্ত আদর্শগুলি হিংসা ও হানাহানি এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই-এর মধ্যে হারিয়ে যায়। বিপ্লব গোষ্ঠী বিশেষকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত করে এবং ক্ষমতার নেশা এমন জিনিস যা অচিরে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পরবর্তীকরণ আনে। জয়প্রকাশ সেই কারণে চীন ও রাশিয়ার বিপ্লবকে রাজনীতিক বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। সামাজিক বিপ্লব না হওয়ার জন্য অর্ধ বিপ্লব থেকে গেছে। সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য রাজনীতিক ও সামাজিক উভয় প্রকার বিপ্লব দরকার। একমাত্র সামাজিক বিপ্লবই সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। জয়প্রকাশের কথাতেই বলা যাক −A social revolution is a fundamental change in the economic political and social power structure, so that power comes to be exercised at the work place. (J.P. Towards Total Revolution P. 227) তিনি সামাজিক বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তনকে একসঙ্গে বিচার করেছেন। অতীতে যে তিনটি বিপ্লব হয়েছিল সেগুলি আমূল পরিবর্তন আনতে পারেনি এই এই কারণে যে শোষণ, সম্পত্তির মালিকানা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অতীতে যে অবস্থায় ছিল বিপ্লবোত্তর যুগেও মোটামুটি সেই অবস্থায় থেকে গেছে। বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য হবে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বাস্তবায়িত করা। জয়প্রকাশ মনে করতেন যে তিনি যে সম্পূর্ণ ক্রান্তির কথা বলেছেন একমাত্র সেটাই ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারে।

অতীতের রাজনীতিক বিপ্লবগুলি মানুষের চেতনা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোন সংশোধন বা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবের লক্ষ্য হবে মানুষের মননের মধ্যে পরিবর্তন আনা। ব্যক্তির চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তন না হলে কোন বিপ্লবই সমাজের স্থায়ী কল্যাণ করতে পারে না। চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিপ্লব দেখে তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লবোত্তর যুগ বিপ্লব-পূর্ব যুগ থেকে খুব বেশি পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ছিল না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বিপ্লব সামাজিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জকতে কোন পরিবর্তন আনেনি। তাই জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবের কথা বলেছেন। অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে ব্যক্তির পরিবর্তন হয় না, উভয়ের পরিবর্তন দরকার (The system as well as the individual must undergo the process of change simultaneously. A systemic change without a change in the individual man is incomplete and unstable and vice versa.– Sa. Das Gupta P. 4)।

— ০ —